আদিবাসী সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব ও সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলঃ

একটি দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের মূল চাবিকাটি হলো শিক্ষা। সুন্দরবন উপকূলে যেসব আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুন্ডা, মাহাতো, উরাও, রাজবংশী ইত্যাদি এবং তারা শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপনদিকে একটা সময় তারা শিক্ষার চেয়ে শ্রমকে বেশি গুরুত্ব দিত। সেকারণে অবিভাবকগণ তাদের লেখাপড়ার পরিবর্তে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজও পর্যন্ত এই এলাকার মুন্ডারা এখনও অনগ্রসর ও সভ্য সমাজ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রায় ২২০ বছর আগে ভারতে ঝাড়খন্ড প্রদেশের রাজধানী রাঁচী জেলা থেকে তৎকালীন জমিদারেরা এসব মুন্ডাদেরকে নিয়ে আসেন অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য। এই সমাজের মাঝে শিক্ষার প্রসার না ঘটায় আজও তারা নিজেদের ও সমাজের তেমন পরিবর্তন করতে পারিনি। বরং তাদের যেটুকু বসতভিটা ছিল সেটাও এখন হারাতে বসেছে।

২০০১ সাল থেকে এসব মুন্ডা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইতালীয়ান নাগরিক শ্রদ্ধেয় ফাঃ লুইজী পাজ্জী এস,এক্স পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বেসরকারী সংস্থা পরিত্রাণ এর মাধ্যমে কয়েকটি টিউশনী স্কুল শ্যামনগর উপজেলায় শুরু করেন। এরপর তিনি ২০০২ সাল থেকে মুন্ডা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী এমন কিছু যুবককে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করেন। তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন মুন্ডাপাড়ায় টিউশনী স্কুল চালু করেন এবং সেই সময়ে যেসব মুন্ডা ছেলে-মেয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা করত তারাই মূলত এই টিউশনী স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার সহযোগীতায় যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেসব মুন্ডা যুবক কাজ করতে আগ্রহী তারা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মিটিং করে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন অবিভাবকদের নিকট। সেই শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত টিউশনী স্কুল চালু রয়েছে।

ফাঃ লুইজী পাজ্জী এস,এক্স এর সার্বিক সহযোগীতায় ২০০৩ সালে সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্) গঠিত হয়। সংস্থার সূচনালগ্ন থেকে এখনও পর্যন্ত কম্যুনিটি স্কুল প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। বর্তমানে সামস্ এর অধীনে তালা ও শ্যামনগর উপজেলায় মোট ১৬টি কম্যুনিটি টিউশনী স্কুল চালু রয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুন্ডাপাড়ায় এই কম্যুনিটি টিউশনী স্কুল রয়েছে যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ের (শিশু শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি) সকল মুন্ডা ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তবে এই কম্যুনিটি টিউশনী স্কুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে তারা পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি মুন্ডাদের নিজস্ব ভাষা সাদৃ এর চর্চা করা হয় এবং আদিবাসী সংস্কৃতি (নাচ-গান ও আদিবাসী মুল্যবোধ) সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে শ্যামনগর ও তালা উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মোট প্রায় ৩০০ এর অধিক মুন্ডা ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নরত রয়েছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট প্রায় ১৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট প্রায় ৮ জন এবং স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৬ জন রয়েছে। যাহা তুলনামূলক অনেক কম। তবে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গত ২০০৩ সালের পরে এই মুন্ডা সমাজের যে পরিবর্তন এসেছে সেখানে ফাঃ লুইজী পাজ্জী এর অবদান অনস্বীকার্য। সামস্ পরিবার এবং এই এলাকার মুন্ডারা তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

আদিবাসী মুন্ডা সমাজের পরিবর্তনের জন্য তিনি আরেকটি দিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা নারী শিক্ষার প্রসার। ২০০৩ সাল থেকে তিনি তাঁর বাস ভবনে (যীশু নাম আশ্রম) **মুন্ডা শিক্ষা কেন্দ্র** চালু করেন যেখানে এখন ১৮ জন মুন্ডা মেয়ে পড়াশুনা করছে। মুন্ডা শিক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকে এখন অনেক অবিভাবক যারা তাদের মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারে না তারা তাদের মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে এই মুন্ডা শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ৪ জন মেয়ে এস,এস,সি পরীক্ষায় পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে আছে-৩ জন, সপ্তম শ্রেণিতে আছে-৪ জন, দশম শ্রেণিতে আছে- ২ জন, এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থী আছে- ৪ জন এবং স্নাতক শ্রেণির ১ জন মেয়ে আছে। এর ফলে কিছুটা হলেও মুন্ডা সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিস্তার প্রসার প্রয়োজন এবং তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এই অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সরকারকেও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমুহ ও ব্যক্তিবর্গকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ফাঃ লুইজী পাজ্জী মুন্ডা সমাজের শিক্ষার গুরুত্ব হিসেবে তিনি বলেন, সমাজের উন্নয়ন করতে হলে স্ব-শিক্ষিত হতে হবে। কারণ স্ব-শিক্ষিত লোক মাত্রই সু-শিক্ষিত। সুতরাং, শুধু শিক্ষিত হলেই সমাজের পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হলে স্ব-শিক্ষিত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে এই উক্তির তেমন চর্চা নেই। এজন্য তিনি সকলকে স্ব-শিক্ষিত হওয়ার জন্য আহবান জানান। বিশেষকরে সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়কে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে যে দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো- (ক) আত্ম উন্নয়ন বা নিজেকে পরিবর্তন করা এবং (খ) সমাজের পরিবর্তন করা। যদি কমপক্ষে এই দুটি কাজ ভালভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে যেকোন সমাজের বা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্ভব।

আদিবাসীদের বর্তমান ভূমি অবস্থা ও প্রেক্ষিত-বাংলাদেশ ঃ

আদিবাসীদের জীবনের সাথে ভূমি সম্পর্কটি খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। ভূমি ছাড়া তাদের জীবন যেন কল্পনাতীত। তাই আদিবাসীদেরকে ভূমিপুত্র বলা হয়। এক সময় এই অঞ্চলের আদিবাসী মুন্ডাদের অনেক জমি ছিল তবে কোন দলিল ছিল না। তবে মুরব্বীদের নিকট থেকে যতটুকু জানা যায় সেই সময় হাত কাটা সম্পতি ছিল। অর্থাৎ যে যতটা জমি আবাদ করে নিতে পারবে সে ততটুকু জমির মালিক হবে। আবার দলিল হিসেবে তাদের নিকট জমিদারেরা যে কাগজ দিয়েছিল তাহা পাটা নামে পরিচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশের আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকায় আদিবাসীরা তাদের জমি হারাচ্ছে। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীরা এখন অনেক আতঙ্কে জীবন যাপন করছে। সরকার বিশেষ এলাকার উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ফরেষ্ট বা পর্যটন এলাকা গড়ে তুলছে তাতে করে আদিবাসীরাই উচ্ছেদ হচ্ছে বেশি। তাদের জমি সরকার অধিগ্রহণ করছে বেশি। আবার শিল্প এলাকা গড়ে তোলার জন্যও আদিবাসীদের ভূমিকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে সরকার। অপরদিকে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কৌশলে তাদের জমি দখল করে নিচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাল দলিল, বন্ধকী চুক্তিনামা দলিলে পরিণত করা, এক বিঘা জমি ক্রয় করে এক একর রেজিষ্ট্রি করে নেওয়া, মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা ইত্যাদি। এসব মুন্ডাপাড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্যামনগর উপজেলার কাশিপুর মুন্ডাপাড়া, ধুমঘাট মুন্ডাপাড়া, ভেটখালী মুন্ডাপাড়া, কালিঞ্চী মুন্ডাপাড়া, গাবুরা মুন্ডাপাড়া। সম্প্রতি সময়ে ধুমঘাট মুন্ডাপাড়ায় জমি কেন্দ্রিক সংঘর্ষ হয়েছে এবং একজন মুন্ডা নারী লাঞ্ছিত ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রভাবশালী মহল এই পাড়ার অনেক নারী পুরুষের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমুলক মামলা হয়েছে। এখন এসব পাড়ার মুন্ডারা আতঙ্কে দিন কাটাচেছ। অপরদিকে কাশিপুর মুন্ডাপাড়ার মুন্ডাদের এখন বসবাসের জমিটুকু হারাতে বসেছে। চিংড়ী ঘেরের কারণে তাদের গোসল করার পরিবেশ নেই, যেটুকু বসতভিটা আছে সেখানে কোন সবজী চাষ করতে পারে না। তাদের বাপদাদার ভিটায় হারানোর শঙ্কায় রয়েছে। এভাবে বিভিন্ন মুন্ডাপাড়ায় প্রভাশালী মহল মুন্ডাদের জমি জবর দখল ও কৌশলে দখল করে নিচ্ছে।

১৯৫০ এর রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারা'য় আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরের বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো- কোন আদিবাসী/উপজাতি ব্যক্তি প্রয়োজনে তার জমি যদি কোন বাঙালী সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা এসিল্যান্ড এর অনুমতিপত্র আবশ্যক। কিন্তু যদি কোন আদিবাসী/উপজাতি প্রয়োজনে তার অংশ অপর আদিবাসী/উপজাতির নিকট বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা এসিল্যান্ড এর অনুমতি প্রয়োজন হবে না। তালা ও শ্যামনগর উপজেলার আদিবাসীরা আজও ভূমি হারানোর শঙ্কায় রয়েছে।

২০১৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ,ক,ম মোজাম্মেল হক বলেন, "পাহাড়ের মতো সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে। এমন একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে যিনি তাদের সমস্যা অনুধাবন করতে পারেন"। তিনি আরও বলেন, সমতলের আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে জমি দখলকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেন (তথ্যসূত্রঃ http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1076230.bdnews)|

অপরদিকে মধুপুর থেকে উন্নয়নের নামে ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ না করার দাবী জানিয়েছে আদিবাসী সংগঠনগুলো। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৯ হাজার ১৪৫ একর জমিকে **সংরক্ষিত বনভূমি** ঘোষণা করেছে। যেখানে ১৩টি গ্রামে কয়েকশত বছর ধরে গারো, বর্মণ, কোচসহ প্রায় ১৫ হাজারের অধিক ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে। সরকারের এই ঘোষণার ফলে এখানে বসবাসরত আদিবাসীদের জীবন সঙ্কটের মুখে। অপরদিকে রাজশাহী অঞ্চলের গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্ম এর চুক্তিভিত্তিক অধিগ্রহণকৃত জমি মূল মালিকের বা উত্তরাধিকারী আদিবাসী ও বাঙালীদের ফেরত দেওয়ার দাবীতে এলাকায় আদিবাসীদের বাপ-দাদার হাজার হাজার একর জমি ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য স্থানীয় আদিবাসীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। এভাবে দিনের পর দিন বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানী বিশেষ করে আদিবাসীদের জমি দখল করে তাদেরকে সেই পিতৃ পুরুষের ভিটা থেকে বিতাড়িত করছে। যার কারণে আজ দেশের আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

আদিবাসীদের জীবন, সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বীকৃতিঃ

বাংলাদেশে বসবারত আদিবাসীরা অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংগ্রাম ও লড়াই অব্যাহত রেখেছে। পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসীরা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য কখনও এককভাবে আবার কখনও যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী ও আন্দোলন বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি আদিবাসী বান্ধব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আদিবাসীদের অধিকার-আন্দোলনের শরীক হচ্ছেন। এদেশের বসবাসরত আদিবাসীদের একটি বড় দাবী হলো সাংবিধানিক ভাবে আদিবাসী স্বীকৃতি পাওয়া। কিন্তু এ দাবী এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। তবে ২০১১ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার আদিবাসীদেরকে **ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি ও সম্প্রদায়** হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে এসব আদিবাসীদের (পাহাড়ী অঞ্চল ব্যতীত) উন্নয়নের জন্য বরাদ্ধ দিয়ে থাকে যাহা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তুলনায় খুবই কম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (চঔঝঝ) এর চুক্তির ফলে পাহাড়ে কয়েক দশকের সংঘাতের অবসান ঘটে যাহা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো চুক্তির দীর্ঘ ১৮ বছর পার হলেও আজও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসিনি। আদিবাসীদের অধিকার ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সরকার সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে যাহা ককাস নামে পরিচিত। কিন্তু সরকারের সহযোগীতার অভাবে উক্ত কমিটি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। যার ফলে আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়নের বিধান প্রণয়ন করলেও এসব জাতিসমূহের জাতিসত্ত্বা, রাজনৈতিক, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, অর্থনৈতিক, ভূমি অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি এখনও পুরণ হয়নি। অপরদিকে পঞ্চাদশ সংশোধনীতে উল্লেখিত উপজাতি, ক্ষুদ্র-জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আখ্যাগুলো আদিবাসী জনগণ এখনও গ্রহণ করেনি। আবার সংবিধানে ৬ (ক) ধারায় "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী" মর্মে উল্লেখের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস এর মাধ্যমে আমাদের দাবী সমূহঃ

১। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কোটা ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২। আদিবাসীদের ভূমি বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৭ ধারা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা প্রত্যাহার করা।

৩। উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত নীতি-নির্ধারণ কর্মসূচীতে আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৪। আদিবাসীদের জীবনধারাকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করা।

৫। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যতার সাথে যথাযথ সঙ্গতি বিধানের জন্য উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা; আদিবাসী নারী, শিশু ও তরুণদের গুরুত্ব প্রদান করে আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬। সরকার কতৃক প্রদত্ত স্থানীয় সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৭। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে উপজেলা ভিত্তিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।